একুশের ঢেউ EKUSHER DHEU

ISSN: 2454-7182
IMPACT FACTOR: 8.158

An International Online Indexed Research Journal of Language, Literature and Culture covering Arts & Humanities as a broad area (Peer-reviewed, Refereed Journal, Quarterly)

Women in Al Mahmud's short stories: Canvases of art in flesh and blood bodies

আল মাহমুদের ছোটগল্পে নারী: রক্তমাংসের শরীরে শিল্পের ক্যানভাস

Name of the Author: **Dr. Rejaul Islam**

Affiliation: **Assistant Professor, Dept. of Bengali**

Bhairab Ganguly College, Kolkata, India

Abstract: Although Al Mahmud (1936–2019) is primarily known as a poet, his short stories present a distinctive imagery of the female body. In stories such as *PanKouri'r Rokto* (The Blood of the Cormorant), *Kalo Nouka* (The Black Boat), *Rokoner Shopnodola* (Rokon's Dream-Swing), and *Jolbeshya* (The Water Prostitute), he places women and nature in parallel, exploring the psychological dimensions of biological desire and sexuality.

In *PanKouri'r Rokto*, the writer merges the body of the newly married Adina with the image of a black cormorant, where the freshness of both woman and nature blends with the longing of virility. In *Kalo Nouka*, Rasu finds the image of his deceased wife Sati in the naked body of his daughter-in-law Kali, reflecting the complexities of human relationships and the subconscious mind. In *Rokoner Shopnodola*, multiple female bodies appear in Rokon's dream and merge like strokes of an artist's brush to form a colorful canvas, where the female body in its uncovered form becomes a unified work of art. Similarly, in *Jolbeshya*, the body of a prostitute is portrayed as mysterious and transient, much like a river.

In Al Mahmud's short stories, the female body is not merely an object of desire; rather, it becomes a symbol of life's vitality, a reflection of nature, and a medium for the writer's artistic expression. In his writing, the female body serves as a central element for revealing the biological and psychological depths of human life.

Keywords: Al Mahmud, Short-stories, Women-self, Women-body, Imagery, Biology, Sexuality, Nature, Aesthetics, Psychology

আল মাহমুদের ছোটগল্পে নারী: রক্তমাংসের শরীরে শিল্পের ক্যানভাস

ড. রেজাউল ইসলাম

বাংলা সাহিত্যের বহুমুখী আঙিনায় অবাধ-বিচরণকারী কবি-সাহিত্যিক আল মাহমুদ ১৯৩৬ সালের ১১ জুলাই বাংলাদেশের কুমিল্লা জেলার ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরের মৌড়াইল গ্রামের মোল্লাবাড়ির সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মূলত কবি হিসেবে পরিচিত হলেও উপন্যাস ও ছোটগল্পের আঙিনার তাঁর অনবদ্য সৃষ্টি পাঠককুলের কাছে নিঃসন্দেহে এক বিশেষ মাত্রা সংযোজন করতে সক্ষম হয়েছে। 'সত্যযুগ' পত্রিকায় প্রকাশিত ছোটগল্প 'তিতাস চরের ছেলে' প্রকাশের মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যে তাঁর আত্মপ্রকাশ ঘটে। সাংবাদিকতা, পত্রিকার সম্পাদনার মতো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বের পাশাপাশি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ, কারাবরণ এবং স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের শিল্পকলা একাডেমি প্রকাশনা বিভাগে ১৯৯৩ সাল পর্যন্ত দায়িত্ব পালনের বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবনাভিজ্ঞতা তাঁর সৃজনকর্মকে রঙিন করে তুলেছে। সাহিত্যকর্মের জন্য তিনি পেয়েছেন – 'বাংলা একাডেমি পুরস্কার', 'রাষ্ট্রীয় পুরস্কার একুশে পদক', 'ফিলিপস্ সাহিত্য পুরস্কার', 'শিশু একাডেমি পুরস্কার', 'অলক সাহিত্য পুরস্কার', 'জীবনানন্দ দাশ স্মৃতি পুরস্কার', 'সুফি মোতাহার হোসেন সাহিত্য স্বর্ণপদক', 'নাসির উদ্দিন স্বর্ণপদক', 'ঢাকা পোষ্ট স্বর্ণপদক' এবং কলকাতা থেকে 'জয়বাংলা সাহিত্য পুরস্কার', 'কাফেলা সাহিত্য পুরস্কার' এবং সমান্তরাল কর্তৃক গৌরবময় 'দ্বিতীয় ভানুসিংহ সন্মাননা পদক'। অবশেষে ২০১৯ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি ৮২ বছর বয়সে ঢাকা শহরের 'ইবনে সিনা স্পেশালাইজড হাসপাতালে' কবি-সাহিত্যিক আল মাহমুদ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

আল মাহমুদের নির্বাচিত ১০টি ছোটগল্প (পানকৌড়ির রক্ত, কালো নৌকা, রোকনের স্বপ্নদোলা, জলবেশ্যা, বুনো বৃষ্টির প্ররোচনা, মাংসের তোড়ণ, ভেজা কাফন, নীল নাকফুল, খনন এবং মীরবাড়ির কুরসিনামা) —এর নিবিড়পাঠ ও অনুসন্ধানের মাধ্যমে তাঁর ছোটগল্পের বর্ণময় শৈল্পিক ক্যানভাসে নারী-শরীরের অপূর্ব উপস্থাপনার বহুকৌণিক বিন্যাসই আলোচ্য প্রবন্ধে উন্মোচনের প্রয়াস করা হয়েছে। শিল্পসম্মতভাবে নারী-অঙ্গের বাচনিক চিত্রকল্প নির্মাণে কমবেশি প্রতিটি সফল পুরুষ-সাহিত্যিক তাঁর সৃষ্টিকর্মে প্রকৃতির অসীমতার আদলেই নারী-শরীরকে বর্ণময় ক্যানভাস হিসেবে ব্যবহার করেছেন মাত্র। অর্থাৎ কালে-কালান্তরে নারী ও প্রকৃতি যেন সাহিত্যের আঙিনায় পরস্পরের হাত ধরাধরি করে চলে। সাংবাদিকতা পেশায় যুক্ত থাকার সুবাদে আল মাহমুদ প্রত্যক্ষ করেছেন নাগরিক ও গ্রামীণ জীবনের নির্মম সত্যকে। জীবন-জটিলতার বহুমুখী অভিঘাতে জীর্ণ ব্যক্তি, পরিবার কিংবা সমাজের বিভিন্ন চরিত্ররা আল মাহমুদের গল্পবিশ্বে ভীড় করেছে প্রকৃতির স্বভাবিক ছন্দেই। অসংখ্য প্রতিবন্ধকতার মাঝেও তাদের জৈবিক কামনা-বাসনার মনস্তাত্ত্বিক অভিপ্রায় অকৃত্রিমভাবে চিত্রিত হয়েছে তাঁর ছোটগল্পে।

আল মাহমুদের গল্পবিশ্বে চিত্রিত নারীর শরীরী ক্যানভাসের সূচকবিন্দু চিহ্নিতকরণের প্রয়াসে সর্বপ্রথমে উল্লেখ করতেই হয় 'পানকৌড়ির রক্ত' ছোটগল্পের কথা। আলোচ্য গল্পের ঘটনাক্রম খুব সামান্য হলেও লেখকের অভিপ্রায় নিঃসন্দেহে অসামান্য। সদ্য বিবাহিত যুবক-কথক বিবাহের রীতি পালনের কারণে

শ্বশুরবাড়িতে এসে পাখি শিকারের যাওয়ার সামান্য ঘটনাক্রমের মাধ্যমে লেখক একটি কালো রঙের পানকৌড়ি পাখির সঙ্গে কথকের নববধূ আদিনাকে একাকার করে দিয়েছেন। কথকের মনে হয়েছে –

> "একটা বিষয়ে পাখিটার সাথে আমার সাতদিন আগে বিয়ে-করা স্ত্রীর একটা মিল খুঁজে পাচ্ছিলাম। সেটা তরতাজা একটা সতেজ ভাব। আদিনা কালো হলেও যেমন তার চামড়ার সতেজ ভাবটা সবসময় লেগে থাকে, পাখিটার কালো তেলতেলে পালকের মধ্যেও তেমনি ভাবটা দেখেই আমি চিনতে পেরেছি। মাঝে মাঝে সকালবেলার শিশিরভেজা ঘাসেও এই সরল ঔজ্জ্বল্য আমার মন ভুলিয়ে দিলে আমি আদিনার কথা ভাবি।"[১]

লেখক, কথকের ভাবনায় পাখি-প্রকৃতি-নারীকে যেন একই সমান্তরাল সরলরেখায় উপস্থাপন করতে চেয়েছেন। কথকের স্মৃতিচারণায় উঠে আসে আদিনার কৈশোর কালের কথা অর্থাৎ প্রতিবেশি হওয়ার সুবাদে কথকের গভীর মনোযোগে ধরা পড়েছে আদিনার 'গায়ে-গতরে' বড় হয়ে ওঠার বিভিন্ন স্টেজের সুক্ষ্ম চিত্র।

গল্পের মূল অভিপ্রায় নিহিত আছে পানকৌড়ির সমান্তরালে আদিনার পাশাপাশি শিকারীর সমান্তরালে বীর্যবান পুরুষের পুরুষত্ব। লেখকের উপলব্ধিতে—

> "বীর্য-বর্ষণকারীদেরও যেমন রমণলিপ্তা নারীর মুখমণ্ডল, বাহুমূল, স্তনযুগলের প্রত্যক্ষ অবলোকন ও পেষণের প্রয়োজন অবধারিত হয়ে ওঠে, কারণ এসব উপাচারের স্বতঃস্ফূর্তি রক্তকে মথিত করলে পুরুষের শরীরে একটা নিক্ষেপনীতিতে ঋজু হতে হতে এক অন্তরালবর্তী পুলকময় সত্তাকে নির্গলনে বাধ্য করে। যদিও বেগবান বারি জরায়ুকে বিদ্ধ করবে কি করবে না, এ নিয়ে বর্ষণকারীদের কোনো মাথাব্যাথা থাকে না। বারুদ-বর্ষণকারী শিকারির নীতিও তেমনি।"[২]

সার্থক শিকারির বারুদবর্ষণে অনিবার্যভাবে আহত পাখির রক্তাক্ত হওয়ার দৃশ্যকল্প লেখক বীর্যবান পুরুষের পুরুষত্বের সংস্পর্শে একজন নারীর প্রথম যৌনমিলনের দৃশ্যকল্পের আঙ্গিকে চিত্রিত করেছেন। পানকৌড়ি ও তার রক্ত কিন্তু আলোচ্য গল্পের মূল অভিপ্রায় নয় বরং সদ্য বিবাহিত কথক ও তার স্ত্রীর বৈবাহিক জীবনের স্বর্গীয় অনুভূতি (যা প্রকৃতির মতোই অসীম ও রহস্যপূর্ণ) আল মাহমুদ কথকের চোখ দিয়ে প্রকৃতির বিস্তৃত প্রেক্ষাপটে আদিনার শরীরী-ক্যানভাসেই উপস্থাপন করতে চেয়েছেন। এক্ষেত্রে গল্পের শেষ অংশটি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক—

> "আমি আবার আমার একনলা বন্দুক হাতে ত্রিকোণাকৃতি চরভূমির নরম গুল্মলতায় পা মাড়িয়ে চলতে লাগলাম। নদীটা যেখানে বাঁক নিয়েছে আমি সেখানে এসে পেশাদার শিকারির মতো হাঁটু গেড়ে বন্দুক বাগিয়ে বসলাম। আমার বসার সাথে সাথে কালো বেলুনের মতো একটা পানকৌড়ি পানির ওপর ভেসে উঠল। আমি মুহূর্তমাত্র বিলম্ব না করে গুলি ছুড়লাম। গুলির শব্দ আর বন্দুকের পাল্টা ধকলে আমার চোখের সামনে সমগ্র নিসর্গচিত্রটি ফেটে চৌচির হয়ে গেল। আমি দেখলাম, একটি শ্যামবর্ণ নারীশরীর নদীর নীলিমায় আপন রক্তের মধ্যে তোলপাড় করছে। মনে হল, আলোকিত এই মুখ, বাহু, বুক ও যুগল-উরু আমার চেনা। আমি আদিনার নাম ধরে নদীর দিকে ডাক দিতে গেলে দেখলাম সেই অঙ্গশোভা ঢেউয়ে ছলছলানি তুলে ডুবে যাচ্ছে।

আমি বন্দুকের গরম নলে গাল চেপে অসহায়ের মতো বসে রইলাম। বারুদের গন্ধে আমার চারপাশটা ভরে যেতে লাগল।”[৩]

আলোচ্য গল্পের নিবিড় পাঠে পাঠকের মেনে নিতে বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ নেই যে, আল মাহমুদ ‘পানকৌড়ির রক্ত’ গল্পের বাচনিক চিত্রকল্প নির্মানে স্বার্থকভাবে আদিনার শরীরকে বহুমুখী-বর্ণময় ক্যানভাসে রঙিন করে তুলেছেন।

সমুদ্রের ধারে অবস্থিত জেলেপাড়ার এক মৎস্যজীবী রাসু জলদাসের ব্যক্তিগত ও পরিবারিক জীবনের বিয়োগাত্মক কাহিনী নিয়ে গড়ে উঠেছে ‘কালো নৌকা’ গল্পের প্লট। গল্পের নিবিড় পাঠে আমরা দেখি ‘সন্দীপ’ থেকে বিয়ে করে নিয়ে আসা রাসুর স্ত্রী সতী জলদাসীর এক দশকেরও বেশি সময়ের সংসার জীবনের বিভিন্ন ঘটনাক্রম ও তাদের দৈনন্দিন জীবন-জীবিকার কথা। কলেরার মতো মহামারীতে একের পর এক গ্রাম উজার হয়ে যাওয়ার সময় সতী তার একমাত্র ১০ বছর বয়সী সন্তান দামোদর রেখে পরলোক গমণ করেন, তখন রাসু জীবিকার টানে সমুদ্রে। রাসু দ্বিতীয় বিয়ে না করে আরো ১০ বছর পুত্র সন্তাকে আগলে রেখে শ্বশুরের গ্রাম থেকেই কৃষ্ণ জলদাসের মেয়ে কালীকে দামোদরের বৌ করে ঘরে আনেন। বিয়ের অল্প দিনের মধ্যেই বঙ্গোপসাগরে আকস্মিক তুফানে দামাদরেরও না ফেরার দেশে চলে যাওয়া এবং শোকাহত কালীর উন্মাদবেশে গৃহত্যাগ রাসুর জীবনকে সম্পূর্ণভাবে পালটে দেয়। ১০ বছরের ব্যবধানে স্ত্রী এবং জোয়ান পুত্রের বিয়োগাত্মক পরিণতি প্রত্যক্ষের ফলে রাসু স্বাভাবিকভাবেই হয়ত জীবনের উদাসীন হয়ে যেত। কিন্তু পুত্রবধু কালীর আকস্মিক আগমন তথা রাসুর গৃহেই তার থাকার জোড়ালো সম্মতির ফলেই একপ্রকার বাধ্য হয়েই রাসু স্বাভাবিক ছন্দে ফিরে আসার চেষ্টা করে। স্বামী হারনোর আঘাতে বেসামাল কালী উন্মাদের মতো বাহ্যিক বোধ-বুদ্ধি শূন্য হয়ে উলঙ্গ কিংবা অর্ধ-উলঙ্গ হয়ে চলাফেরা করে এবং সুযোগ পেলেই দিগম্বরী হয়ে পাড়ার মধ্যে, সমুদ্রের উপকূলে ছুটে বেড়ায়। সামাজিক সম্পর্কের দিক থেকে কালী রাসুর পুত্রবধূ হলেও লেখক কালীর এরূপ অবস্থার প্রেক্ষাপটে রাসুর মানসিক অবচেতন মনের দ্বিরালাপিত বিন্যাস আমাদের কাছে তুলে ধরেছেন। রাসুর চোখে মৎসগন্ধা রূপী প্রয়াত স্ত্রী সতীর শরীরী অবয়ব যেন পুত্রবধূ কালীর শরীরী অবয়বের সাথে একাকার হয়ে যায়—

“শ্যামা চলে গেলে রাসু দরজার তালাটা খুলল। দরজার একটা পাট ধাক্কা দিতেই শায়িত কালীকে দেখল রাসু। সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে মাদুরের ওপর শুয়ে আছে।

সূর্য্যের শেষ রশ্মি এসে পড়েছে ঘরের ভেতর। পরন্ত তীর্যক আলোয় নিরাবরণ নারী-সৌন্দর্যকে প্রত্যক্ষ করল রাসু। নিঃস্বাসের দোলায় কালীর বুক দুটি ওঠানামা করছে। নিদ্রিতা কালীর ঠোঁটজোড়া ঈষৎ কুঞ্চিত হয়ে আছে। পিঠে, গলায়, উরতের ফাঁকে ঘামের ফোটা চিকচিক করছে। মাথার দিকে তাকালে বোঝা যায় শ্যামা আজ চুলে তেল দিয়ে যত্নে খোঁপা বেঁধে দিয়েছিল। অসাবধান নিদ্রায় তা পিঠে, বালিশের ওপর ছড়িয়ে পড়েছে।

এই প্রথম রাসুর সতীর কথা মনে পড়ল। ভুলে যাওয়া আনন্দের গন্ধ যেন বইতে লাগল বুকের ভিতর। একদৃষ্টে কালীর নগ্নদেহের দিকে তাকিয়ে থেকে রাসু ঘরের ভেতর গিয়ে দরজার পাটটা ধাক্কা মেরে লাগিয়ে দিল। দুয়ার বন্ধের শব্দে কালী চোখ মেলে চাইল।"[৪]

আলোচ্য বয়ানে অনুভবী পাঠকের বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না গল্পের মূল সংকেতবিন্দুকে। আর এই সংকেতবিন্দুর কেন্দ্রেই যেন আবর্তিত হয়ে চলেছে কালীর শরীরী-ক্যানভাসে। সমুদ্রে বেলাভূমির পড়ন্ত বিকেলে কালী ও তার শরীরী অবয়বের সৌন্দর্য লেখকের বচনিক গুণে প্রকৃতির আসীমতার সঙ্গে মিশে গেছে। লেখকের অভিব্যক্তিতে কালীর শরীরী অবয়ব যেন 'এক দীর্ঘতমা নগ্ন নারী শরীর সূর্যকে ভেদ করে ঢেউয়ের ওপর দণ্ডায়মান'। প্রকৃতির স্বাভাবিক পথেই গল্পের অনিবার্য পরিণতিকে ঠেলে দিয়ে লেখক দেখিয়েছেন রোগে-শোকে-বয়সে জীর্ণ পত্নীহীন রাসু তার বিধবা পুত্রবধূর মধ্যেই খুঁজে নেন তার সতীকে এবং শ্বশুর হলেও রাসুর মধ্যে কালীও খুঁজে পায় তার দামোদরকে।

'রোকনের স্বপ্নদোলা' গল্পের নামকরণের মাধ্যমেই পাঠক অনুভব করে নিতে পারেন ম্যাজিক রিয়ালিজমের দৃশ্যকল্প। গল্পের নায়ক রোকন ও তার সহধর্মী রোকেয়ার এক রাতের ট্রেনের সফর ঘিরেই লেখক গল্পের প্লট নির্মাণ করেছেন। শীতের রাতে ট্রেনের কামরায় রোকন-রোকেয়ার পাশাপাশি একজোড়া নর-নারীও ছিল। রোকনের আবচেতন মনে লালিত নারী-শরীরের সৌন্দর্য চিরাকাঙ্খিত চেতনা তার স্বপ্নালোকে ধরা দিয়েছে পূর্ব পরিচিত নূরজাহান, আরতি এবং কুসুমের সঙ্গে। প্রথমবস্থায় তারা প্রত্যেকে প্রথাগত পোশাকে উজ্জ্বল কিন্তু স্বপ্নের ক্রম অগ্রগতিতে লেখক আমাদের দেখিয়েছেন—

"নূরজাহান, আরতি আর কুসুমের সাথে রোকেয়াও গলা জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে আছে। যেন যমজ চার বোনের মতো। তাদের শরীর সজ্জা ও শাড়িহীন। অঙ্গ অনাবৃত থাকায় চারজনের মুখমণ্ডলেই কোনো বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ছে না। রোকন এঁদের পোশাক-আশাকের কথা ভাবল। খুঁজল মনে মনে। দেখল, রকেয়ার সঙ্গিনীরা এবং রোকেয়া নিজে মাথার কেশরাশি বিলম্বিত করে বুকের ওপর রেখেছে। রোকনের চোখ স্বাভাবিক পুরুষসুলভ দ্রুততায় পূর্বে সম্পর্ক রয়েছে এমন সব অঙ্গ-প্রতঙ্গ প্রত্যক্ষ করল। দেখল যোনিপ্রদেশের কেশরাশি প্রস্ফুটিতা অপরাজিতা ফুলের মতো গাঢ় নীল আভায় মণ্ডিত। অনেকটা মুয়ূরের পালকের ওপরকার কারুকার্যের মতো। বাহুলতা অসহায় মুদ্রায় ইতস্তত কম্পিত হচ্ছে। কখনো স্তন, কখনো যোনিফলকের ওপর স্থাপিত হয়ে নিশ্চয়তার অভাবে অস্থির ও ভীরুভাবে নড়ে যাচ্ছে।"[৫]

জীবনে চলার পথে অসংখ্য নারীর মুখ স্মৃতির পাতায় জমে থাকলেও তাদের দৈহিক অবয়ব সম্পর্কে ততটা নিখুঁত ধারণা রোকনের হওয়ার কথাও নয়। তাই হয়ত রোকেয়ার শরীরের সঙ্গে অন্যান্য নারী-শরীর একাকার হয়ে গেছে। ঘটনার ধারাবাহিকতায় রোকনের ব্যক্তিগত জীবনের বিভিন্ন প্রসঙ্গের পাশাপাশি স্বপ্নের প্রেক্ষাপট বদল হয় চারজন নারীর পরিবর্তে সেখানে হাজির হয় একজন নারী (পূর্ব পরিচিতা হেড মাস্টারের মেয়ে)। সেখানেও লেখক সুকৌশলে নারী-শরীরকেই প্রকৃতির অসীমতার মাঝে রঙিন ক্যানভাসে ফুটিয়ে তুলেছেন ব্যক্তি জীবনের নির্মম সত্যকে। অনিবার্যভাবে এসেছে জাদুকর ম্যাজিশিয়ায় আলাদীনের কথা। জাদু-বাস্তবতার

আদলে নারী-শরীরের চিরন্তন রহস্যকে আমাদের কাছে শিল্পসম্মতভাবে উপস্থান করেছেন আল মাহমুদ। অর্থৎ নারী শরীরের শৈল্পিক সৌন্দর্যের প্রধান প্রতিবন্ধতা তার বাহ্যিক আবরণ। আবরণহীন প্রতিটি নারী-শরীরই যেন শিল্পীর কাছে একটি অভিন্ন ক্যানভাস।

লালপুর হাটে পেঁয়াজ-রসুনের বেপারী (দালালদের তরুণ নেতা) আবিদ বেপারীর প্রাত্যহিক জীবনের আভাস দিয়ে লেখক এক হাটবারে ঘটনাক্রমের ওপর আলোকপাত করে আমাদের উপহার দিয়েছেন 'জলবেশ্যা' গল্পটি। কাহিনীর প্লট খুবই সামান্য—আবিদ বেপারী প্রতি সপ্তাহের মতো সেদিনও লাভের টাকা যত্ন করে বেঁধে ক্লান্তি নিরসনের জন্য (রাতের অন্ধকারে ফুর্তির জন্য) নদীর ওপারে সারিবাঁধা বেদেদের নৌকায় বসে থাকা নিশাচর নারীর সাংকেতিক ইশারাকে পাথেয় করে সেখানে যাওয়ার ফলে সর্প দংশনে ধনে ও প্রাণে তার শেষ হয়ে যাওয়ার কাহিনী। মনসামঙ্গলের সামান্য ছোঁয়া দিয়েই লেখক স্পষ্টভাবে বেউলা নামধারী জলের বেদে-বেশ্যার শরীরকেই কাহিনীর দৃশ্যকল্প নির্মাণের বাচনিক ক্যানভাস হিসেবে ব্যবহার করেছেন। বেউলা শরীরী ক্যানভাসের সূচকবিন্দু হিসেবে উল্লেখ করতেই হয়—'ব্লাউজহীন পরিচ্ছন্ন কালো শরীর। বক্ষস্থলের ওপরভাগটা কণ্ঠার দুটি প্রসারিত হাড় পর্যন্ত জলের মতো কালো হলেও একটু বেশি উজ্জ্বল ও নির্মল'। কিংবা '...পেট আর বুক দিয়ে হাটু আর উরতের ওপর চেপে বসায় পেছন থেকে তার পিষ্ট স্তন দুটির ফুলে ওঠা' কিংবা 'মেয়েটির ঘাড়ের পেশি দাপ্পার দুলুনি যেন দাঁড়াশ সাপের দ্রুতগামী কামলীলা' কিংবা 'বুকের ওপরে গোল আতাফলের মাঝে বসা দুটি ভ্রমরের মতো স্তনের বোঁটা সদাজাগ্রত আলো আঁখিতারার মতো...' প্রভৃতির শৈল্পিক উপস্থাপনায় অনুভবী পাঠকের বুঝে নিতে অসুবিধা হয়না এক কপট-ছলনাময়ী জলবেশ্যার জীবনালেখ্য। জীবন-মৃত্যুর এই নির্মম খেলায় বেউলার শরীরী-ক্যানভাস 'জলবেশ্যা' গল্পটিকে অনন্যমাত্রা দান করেছে। এক্ষেত্রে আবিদ বেপারীর নির্মম পরিণতি গৌণ বরং প্রকৃতি ও নারী তার অসীমতার গুণে লেখকের বাচনিক ক্যানভাসে রঙিন হয়ে দেখা দিয়েছে।

একাধিক ইটখোলার মালিক মাহমুদের ব্যক্তি-পারিবারিক জীবনের একটি বিশেষ বিন্দুতে আলোকপাত করে আল মাহমুদ আমাদের উপহার দিয়েছেন 'বুনো বৃষ্টির প্ররোচনা' গল্পটি। আকাশপথে বিমান সফরে প্রাকৃতিক প্রতিকূলতার কারণে জীবন-মৃত্যুর আশঙ্কায় অন্য পাঁচ জন যাত্রীর মতোই চিন্তিত চল্লিশোর্ধ অথচ নিঃসন্তান মাহমুদের ভাবনাবিশ্বে একটু অন্যরকমভাবে ধরা দিয়েছে তার শিক্ষয়িত্রী স্ত্রী মরিয়মের যাপনচিত্র। লেখক এখানেও আশ্রয় করেছেন প্রকৃতির অসীমতার মাঝে নারীর শরীরী-অবয়বকে। আকাশপথে যাত্রাকালে জানালা দিয়ে বিমানের অবতরণ দৃশ্যের সুনিপুণ উপস্থাপনার মাধ্যমে লেখক একই সঙ্গে দেখিয়েছেন সুসজ্জিত ঢাকা শহরের বিভিন্ন দুরত্বের দৃশ্যপট এবং নারী-শরীর সম্পর্কে বিভিন্ন দূরত্বের রঙিন ক্যানভাস। সমাজকল্যাণমূলক কাজে যুক্ত মরিয়ম তার কাজের মেয়ে জমিলাকে 'দাসীবাঁদী' সম্বোধনে স্বামীর কাছে ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ করলে মাহমুদ মেলাতে পারেনা কোনো হিসেব। ভয়ে কিংবা ভালোবাসায় মরিয়মের নির্দেশে জমিলাকে তার প্রাপ্য টাকা মিটিয়ে তাকে বাড়ির কাজ থেকে বহিষ্কার করার দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে মাহমুদ স্ববিরোধের মধ্যে তলিয়ে গেছে। সেই স্ববিরোধ অনেকটায় যেন প্রকৃতির মতোই অসীম। বাইরে বৃষ্টির মধ্যেও জমিলার কাপড় ধোয়ার দৃশ্য মাহমুদের চোখে কিংবা মানসপটে চিত্রিত হয়েছে নারীর শরীরী

ক্যানভাসে। ভাবনার দ্বিরালাপিক বিন্যাসে অনিবার্যভাবে হাজির হয়েছে 'কায়া মাহমুদে'র পাশাপাশি 'ছায়া মাহমুদে'র ভাবনাবিশ্বের সংঘাত। প্রসঙ্গক্রমে জমিলার শরীরী-ক্যানভাসের সামান্য আভা উল্লেখ করছি—

> "জমিলার বয়েস এই বৃষ্টিতে আর বোঝা যাচ্ছে না। বিশ? বাইশ? পঁচিশ? কে জানে কত। মেয়েটা তার বুক, কাঁধ আর পিঠের ওপর লেপ্টে যাওয়া নিজের পরনের সিক্ত শাড়িটা আলগা করে মাথার ওপর রাখল। তারপর ভেজা চুলের সাথে শাড়িটা দড়ি পাকানোর মতো পেঁচিয়ে চুলের পানি চিপ্তে লাগল। এ অবস্থায় তার কোমরের উপরার্ধ, মাথা পর্যন্ত বেশ বাঁকা হয়ে ঝুঁকে থাকায় তাকে শ্বেতপাথরের বৃষ্টিসিক্ত মূর্তির মতো লাগছে। অনেকক্ষণ পর্যন্ত অবিরল বর্ষণধারার মতো ভিজতে থাকায় পিঠ ও হাতের পেশিকে কঠিন মনে হচ্ছে। বুক দুটিকে মনে হচ্ছে ঝড়ের ঝাপটা-লাগা সিক্তডানা শাদা কবুতরের মতো। তার মুখ প্রবল বর্ষণের ধোঁয়াটে বাতাসের ভেতর অস্পষ্ট থাকায় মাহমুদ তার নাক মুখ আর চোখ দুটিকে দেখতে পাচ্ছে না। তাছাড়া মেয়েটি ঘাড়ের দিকে মুখ ফিরিয়ে রাখায় মাহমুদের দৃষ্টি সেই সীমায় পৌঁছতে পারছে না। মুহূর্তের জন্য মেয়েটি এ অবস্থায় থাকল। তারপরই শরীর সোজা করে বুক ও পিঠ ভেজা শাড়ির জমিন দিয়ে এমনভাবে ঢাকল যেন দিগন্তবিস্তারী বিজুলিবিলাসের পর আকশ ফের নীল শান্তভাব ধারণ করেছে।"[৬]

অনুভবী পাঠকমাত্রই বুঝে নিতে পারে প্রকৃতির প্রেক্ষাপটে নারীর শরীরী ক্যানভাস আরো বেশি মনোময় এবং আকর্ষণীয় হয়ে আলোচ্য গল্পকে অন্যমাত্রা দান করেছে। দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধের কারণে 'কায়া মাহমুদ' মরিয়মের মধ্যেই খোঁজে জীবনের বাঁচার রসদ কিন্তু 'ছায়া মাহমুদ' মুক্ত 'অর্ধেক মানুষ' হওয়ার সুবাদে জমিলার প্রতি আকর্ষণ অনুভব করে এবং জমিলার প্রাপ্য আদায়ে 'কায়া মহমুদে'র সঙ্গে লড়াই করে, জমিলার মধ্যেই খুঁজে পায় জীবনের স্বার্থকতা। অর্থাৎ এককথায় বলা যায় লেখক মরিয়ম কিংবা জমিলার শরীরী ক্যানভাসে দক্ষ শিল্পীর মতো ফুটিয়ে তুলেছেন মাহমুদের অবচেতন মনের দ্বিরালাপিক উদ্ভাষণ।

একটু ভিন্ন স্বাদের গল্প হল 'মাংসের তোরণ'। অনেকটা কৌতুহলে কিংবা যৌবনের আভিঘাতে বিবাহ-বিমুখ আনজাম রাতের অন্ধকারে রেডলাইট এড়িয়া থেকে দিলারা নামের স্বাধীনচেতা-স্বনির্ভর মেয়েকে তুলে নিয়ে বাড়িতে আসে ফুর্তি করার জন্য। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত মায়ের সামনাসামনি পড়ে গেলে বান্ধবী হিসেবে পরিচয় দেয়। স্বাভাবিকভাবে বিবাহ-বিমুখ ছেলের বান্ধবী-প্রীতিতে সন্তুষ্ট আনজামের মা রসিদা বেগম দিলারাকেই তার সম্ভাব্য পুত্রবধূ হিসেবে স্বপ্ন দেখে। একজন স্নেহময়ী মা এবং কামুক পুরুষের মাঝে পড়ে দিলারা রাতের পারিশ্রমিকের আশঙ্কায় কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়। একদিকে আশাহত আনজাম দিলারার পারিশ্রমিক টিপয়ের ওপরে রেখে ঘুমিয়ে যায় অন্যদিকে দিলারা কোনোভাবে নিজেকে মুক্ত করে আনজামের ঘরে পৌঁছয়। সন্তানের কথা ভেবে একই সঙ্গে সক্রিয় হয়ে ওঠে দিলারার বেশ্যা আর জননী সত্তা। লেখকের অভিব্যক্তিতে চিত্রিত হয়েছে আনজামের মানবিক মুখের পাশাপাশি কর্তব্যপরায়না একজন রেডলাইট এলাকার শরীরজীবী নারীর চিত্র—

"দিলারা কী যেন ভেবে হঠাৎ কাঁধের ব্যাগটা রেখে তার নিজের শাড়ি, ব্লাউজ, সায়া ইত্যাদি খুলে ফেলে নিজেকে সম্পূর্ণ উদোম করে ফেলল। কাচের জারে যেখানে ঠান্ডা পানি রাখা, দিলারা সেই জারটি থেকে গ্লাসে ঠান্ডা পানি ঢালল। তারপর সজোরে পানির ঝাপটা লাগাল আনজামের মুখমণ্ডলে।

চমকে চোখ মেলল আনজাম। সামনে নগ্ন দিলারা।

'আসুন। এই যে আমি।'

আনজাম দিলারার শাদা তলপেটের ওপর বাতিটার সবুজ আলোর বিকিরণ দেখতে লাগল। কিন্তু মাথা বা বাহু কিছুই নাড়াতে পারল না। তার স্থিরনিবদ্ধ চোখে দিলারার বিস্তৃত সবুজাভ নাভিমূলকে বাংলাদেশের মানচিত্র বলে মনে হল কিনা, কে জানে। কারণ সেখানে এককালের সন্তানধারণের ফাটল অর্থাৎ বলিরেখা সুস্পষ্ট থাকায় চিহ্নগুলো মাতাল চোখে পদ্মা, মেঘনা, যমুনা বা ধলেশ্বরী বলে ভাবা এখন আনজামের পক্ষে বিচিত্র নয়।"[৭]

'মাংসের তোরণ' গল্পের শেষ চমকের মাধ্যমে লেখক সেই চিরপরিচিত নারী শরীরের বৈচিত্র্যমুখী রঙিন ক্যানভাসকেই প্রকৃতির রঙে রাঙিয়ে অসীমত্বের ব্যঞ্জনায় উত্তীর্ণ করেছেন।

নারী শরীরের বর্ণময় ক্যানভাসের একটি অন্যতম প্রতিনিধিস্থানীয় ছোটগল্প 'ভেজা কাফন'। গল্পকথক সাজ্জাদ ও তার মুমূর্ষু স্ত্রী নূরীর চার বছর সংসার জীবন আলোচ্য গল্পে চিত্রিত হয়েছে কথকের স্মৃতিচারণার মাধ্যমে। বিয়ের অনেক থেকেই হৃদরোগে আক্রান্ত নূরী চিররুগ্না হওয়া সত্ত্বেও সাজ্জাদের পছন্দ (নূরীর শরীরী অবয়ব)—কে প্রাধান্য দিতেই জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত সক্রিয় থেকেছে। কেননা সাজ্জাদ মনে করে 'দেহটাই সব' তাই নূরী ইচ্ছাকৃতভাবেই তার ক্ষণস্থায়ী জীবনে কোনো সন্তানকে পৃথিবীতে এনে সাজ্জাদের বাকি জীবনকে ভারাক্রান্ত করতে চায়নি। প্রকৃতির মতোই বর্ণময় ও অসীম শরীরের যাবতীয় রহস্য নূরী সাজ্জাদের কাছে উন্মোচন করতে চেয়েছে তার চার বছরের সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে। অথচ সাজ্জাদের আকাঙ্ক্ষা পূরণ হওয়ার নয়। তাই হয়ত সাজ্জাদ কাফনে বন্দী তার মৃত স্ত্রী নূরীর দেহকে কবরে শোয়ানোর আগেও আরো গভীরভাবে দেখে নেয়—

"চাদর উঠালে দেখা গেল চাদরের পানি চুইয়ে পড়ে কাফন ভিজে গেছে। ভেজা কাফনে নূরীর শরীর এমনভাবে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, কবরে উপস্থিত সকলই এদিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিলেন। আমি পারলাম না। আমি একদৃষ্টে নূরীকে দেখতে লাগলাম। শাদা কাপড়ে পূর্ণগুণ্ঠিতা অবস্থাতেও নূরীকে যে এমন সুন্দর দেখায়, যেন প্রথম দেখলাম। অথচ নূরীর মুখ মুখ মাথা চুল সবই কাফনে ঢাকা। আমি অপলক চেয়ে রইলাম। সম্ভবত আমার অবস্থা আন্দাজ করে নূরীর ভাই আমি সাহেব আমার কাঁধ স্পর্শ করলেন, 'আর দেরি না। লাশ এবারে কবরে শোয়াতে হবে সাজ্জাদ।"[৮]

সাজ্জাদের চোখ দিয়ে লেখক নূরীর শরীরী ক্যানভাস নির্মানে তাদের চার বছরের সাংসারিক জীবনের অমূল্য ভালোবাসা ও মধুর যাপনের খণ্ডচিত্রকে অখন্ড অবয়বে উপস্থাপন করেছে 'ভেজা কফন' শিরোনামাঙ্কিত ছোটগল্পে।

গ্রামীণ প্রেক্ষাপটে এক কৃষি-মজুরের ব্যর্থ প্রেমের কাহিনী 'নীল নাকফুল' ছোটগল্পে উপস্থাপিত হয়েছে। দূরের ভিন গায়ের কৃষি-মজুর ওসমান ধান কাটার সময় খাটিঙ্গাতে কাজ করতে এসে সেই গাঁয়ের মহিলা কামিন বানেছার সঙ্গে প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ হয়। বলতে গেলে 'এজিন কাবিন ছাড়া বিয়া'। হয়ত পারস্পরিক সম্মতিতে পরের বছরে ধানকাটার সময়ে বানেছাকে নিয়ে ওসমান সংসারী হওয়ার পরিকল্পনা করে। কিন্তু ওসমানের প্রেমের ট্র্যাজেডি এখানে যে, পরের বছর কাজ করতে গিয়ে দেখে খামার মালিক হাসেম চাচার সঙ্গে বানেছার বিয়ে হয়ে গেছে। বানেছাকে বৌ করে ঘরে নিয়ে আসার জন্য ওসমান যে নাকফুল উপহার হিসেবে নিয়ে যায় সেই বানেছাকে চাচী সম্বোধন করে কদমবুসি করে বলতে শোনা যায়—'হুজুর আমি ছোটোচাচীর লাইগা একটা জিনিস আনছি। তাইনে আনার কইছিল গত বছর। আপনার মরজি অইলে জিনিস টা আপনে রাহেন' কিংবা 'কেমন আছেন ছোটোচাচী? আমার লাইগা দোয়া কইরেন' প্রভৃতি চিত্রকল্প অনুভবী পাঠকের হৃদয়কে বেদনায় ভারাক্রান্ত করে তোলে। এখন প্রশ্ন হল আলোচ্য গল্পে লেখক কীভাবে নারীর শরীরী ক্যানভাস বিনির্মাণ করেছেন? উত্তরে বলতে হয় আল মাহমুদের অন্যান্য গল্পের মতো প্রত্যক্ষভাবে হয়ত এই শরীরী ক্যানভাসকে আমরা দেখতে পাবো না। কিন্তু দ্বিতীয় বিয়ে করার প্রাসঙ্গিকতা বা প্রয়োজনীয়তার কথা প্রসঙ্গে হাসেম চাচার অভিব্যক্তিতে পরোক্ষভাবে নারীর শরীরকেই ইঙ্গিত করে। দ্বিতীয় বিয়ে প্রসঙ্গে কথকের প্রশ্নের উত্তর হাসেম চাচা বলেছে—

> "এইডা আর জিগাইও না বেটা, এইডা আমার শরমের কথা। কোনো খান্দানওলা বাড়িতে না। আমার গাঁওয়েরই মাইয়া, আমার বাড়িতে ধানপানের কাজ করত। রূপ দেইখা বাবা ভালো লাগল, মনে ধরল, কইরা ফালাইছি। মুসলমানের মিয়া আবার খান্দান কী? হগলেই আদম-হাওয়ার ফরজন্দ।"[৯]

অর্থ ও ক্ষমতার কাছে প্রকৃত ভালোবাসার স্বীকৃতি না পাওয়া এবং সেটাকেই নিয়তি বলে মেনে নেওয়ার নির্মম বাস্তবতা লেখক আলোচ্য গল্পের মাধ্যমে আমাদের কাছে তুলে ধরেছেন। বানেছার শরীরী অবয়ব তথা শারীরিক সৌন্দর্যই তার প্রেমের প্রধান অন্তরায় হয়ে দেখা দিয়েছে।

'খনন' গল্পের প্লটে আছে ঘুংঘুর-সালদা খালের খনন কার্যের ঘটনাক্রম। সেই কাজে যুক্ত সুখানি হাফিজের যাপনচিত্রই আলোচ্য গল্পের মূল অভিপ্রায়। কর্মসূত্র স্ত্রী ও সন্তান থেকে দূরে নদী-নালায় সময় কাটানো সুখানি হাফিজের ব্যক্তিত্বের পরিচয় দিতেই লেখক আলোচ্য গল্পের মূল ক্যানভাসের সংকেতবিন্দুকে ব্যঞ্জিত করেছেন। বাজারে রাত কাটানোর কারণ হিসেবে তার অকপট স্বীকারোক্তি—'...আমরা গাঙ-পানির মানুষ। হাট-বাজারের কাছে এলেই শরীরটা টনটন করে। বাজারে একটু রাত কাটিয়ে এলাম'। মদ ও মেয়ে-মানুষে আসক্ত সুখানি হাফিজের ব্যক্তিগত জীবনের পরতে পরতে আলো ফেলেই আল মাহমুদ 'খনন' গল্পের বাচনিক ক্যানভাস বিনির্মিত করেন গাঙের ধারে বাজারী মেয়েমানুষের শরীরী অবয়বে। এখানে প্রেম গৌণ,

শরীর কেন্দ্রিক প্রয়োজনই মুখ্য হয়ে দেখা দিয়েছে। এমনি একদিনের ঘটনার চিত্রনে লেখক আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন শরীরী ক্যানভাসের মূল রসদকে—

> "সামনের চৌকিতে বুক পর্যন্ত কাপড়ঢাকা দিয়ে বেশ স্বাস্থ্যবতী একটা মেয়ে শুয়ে আছে। চিত হয়ে থাকায় বালিশের ওপর তার ভেজা চুল একটা পেতে রাখা বালতির ভেতর তলা পর্যন্ত উপচে পড়েছে। চুল বেশ ঘন এবং কোঁকড়ানো। বুক দুটি বড়ো পেয়েলার মতো ভারি বলে বোধ হল। চোখ নিমীলিত। একবার বোধহয় ঘরের ভিতর আমার পা রাখার সাথে সাথে চোখজোড়া মেলেছিল। আবার মুদে ফেলেছে। সম্ভবত সুখানি এতক্ষণ এর মাথাতেই পানির ধারা দিচ্ছিল। মেয়েটার চেহারা একটু ফ্যাঁকাসে। ঠোঁটজোড়া পুরো, মাংসল। ঠোঁটের ওপর পান খাওয়ার চিহ্ন আছে। কালসিটে। বুক থেকে পা পর্যন্ত একটা কাঁথায় শরীর ঢাকা থাকলেও এর শারীরিক সামর্থ্যের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। নাভীর নীচের দিকের অংশ এমনভাবে ভাঁজে চিহ্নিত আছে প্রথমেই সেদিকে নজর পড়ে।"[১০]

কর্মেক্ষত্রের পরিবর্তনের সাথে সাথে সুখানিদের নারী-শরীরও পরবর্তিত হয়, তাদের ভোগের কাছে ধর্মের অনুশাসনও গৌণ। লেখক এখানে নদীর সঙ্গে নারীকে একাকার করে প্রকৃতির অসীমতার আলোকে উদ্ভাসিত করেছেন। কেননা খননকার্যে যুক্ত সুখানিরা নদীর বাঁক বদলে কিংবা ভিন্ন কোনো আলাদা নদীতে কোদাল চালানোর পাশাপাশি সেই একালার বাজারী নারী-শরীরও ঠিক জোগার করে নেয় এবং সেই নারী-শরীরেও চলে তাদের জৈবিক খননকার্য।

আলোচ্য প্রবন্ধের শেষ ছোটগল্প 'মীরবাড়ির কুরসিনামা'। অতীতের কোনো এক সময়ে সম্ভ্রান্ত বনেদী মুসলিম (মীর বংশ) পরিবারের বহু-বিভক্ত অবক্ষয়িত কঙ্কালের অস্থি-মজ্জার কাহিনীকে প্লট হিসেবে ব্যবহার করে লেখক নারীচেতনার ইঙ্গিত দিয়ে শরীর-কেন্দ্রিক জৈবিক যাপনের খণ্ডচিত্রের প্রাসঙ্গিক বিন্যাসে গল্পের বাচনিক ক্যানভাস নির্মাণ করেছেন। মীরবাড়ির গৌবজ্জ্বল অধ্যায়ের সুদীর্ঘ ইতিহাসের পাশাপাশি তাদের সমকালের ব্যক্তি-পারিবারিক-সামাজিক-ধর্মীয় কেন্দ্রিক জীবনের সংকীর্ণতা তথা মীরবাড়ির সমগ্রিক যাপনচিত্রে একই সঙ্গে ব্যঞ্জিত হয়েছে মানুষ ও পাখি (মোরগ)-র দ্বিরালাপিক সহাবস্থান। বিধবা শরিফার পূর্ণ যুবতী মেয়ে আলিমা মীরবাড়িতে 'এক ঝলক মুক্ত বাতাসের মতো' বিরাজ করার চিত্র এখানে বিশেষ উল্লেখযোগ্যতার দাবী রাখে। নূরবানুর রাতাটার (মোরগ) প্রকাশ্য যৌনক্রিয়া গল্পের ক্যানভাস নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। রাতাটার মর্দানির রূপকে চিত্রিত হয়েছে নারী-পুরুষের জৈবিক সামর্থ্যের স্বাভাবিক সমীকরণ—

> "নূরবানু সারাটা উঠোনে দ্রুত তার দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে যুক্ত হয়ে থাকা পাখি দুটিকে দেখল। মুহূর্তমাত্র। মোরগটা ইতোমধ্যেই তার কাজ শেষ করে উঠোনের অন্যান্য মুরগির পালের দিকে ছুটেছে। আর মুরগিটা ছাড়া পেয়ে আরামে পাখা ঝাড়া দিয়ে দাঁড়াল।
>
> মুরগিটার পালক ঝাড়াটা অনেকটা মেয়েদের নাহানোর মতো। যেন গোঁসল দিচ্ছে মুরগিটা। ঠোঁট দিয়ে বুক, ডানা ও রানের পালক ঠোকরাল সে। যেন সঙ্গমের ক্লান্তি, ক্লেদ ধুয়ে ফেলতে

> চাইছে আশরাফ মীরের পালা মুরগিটা। আশরাফ কাগজপত্র রেখে এতক্ষণ স্থিরদৃষ্টিতে রমণলিপ্ত মোরগ-মুরগির আসঙ্গসুখ উপভোগ করল। আশরাফ ভাবল, এখানে এই পশু-পাখিদের জগৎটাই আলাদা। এখানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও সংঘর্ষ-সংগ্রাম থাকলেও, যাকে বলে শ্রেণীসংগ্রাম তা ঠিকমতো উপলব্ধ হয় না। তা না হলে বাড়ির সবচেয়ে অভিজ্ঞ, শক্তিশালী মোরগটা উঠোন থেকে তার তরুণ প্রতিদ্বন্দ্বীদের গায়ের জোরে তাড়িয়ে দিয়ে একা একচ্ছত্রভাবে বাড়ির সকল মুরগির ওপর চরাট করত না। এখানে ভাগাভাগির কোনো ব্যাপার নেই। আছে 'জোর যার মুল্লুক তার' নীতি। যদি আলিমার তরুণ রাতাটা লড়াইয়ে জিতত তাহলে নূরবানুর বয়স্ক, অভিজ্ঞ মোরগটার জীবনই অসহনীয় অর্থহীন হয়ে যেত। তাকে মাথা নামিয়ে ঝুঁটি লুকিয়ে কোনোমতে প্রাণরক্ষার জন্য খাদ্য খুঁটে বেড়াতে হত। পশু-পাখিদের জীবনে পরাজিতদের কোনো মূল্য নেই। পরাজিতরা বাঁচে না। শুধু মানুষের মধ্যেই 'য পলায়তি স জীবতি'। মানুষ পালায় আবার ঘুরে দাঁড়াবার জন্য। আবার লড়াই। আবার বিজয়ী শোষককে মিটিয়ে দেবার চেষ্টা। পরাজিত নিপীড়িত শ্রেণীগুলোর সংঘবদ্ধ হওয়ার অবিরাম কসরত।"[১১]

অর্থাৎ প্রকৃতির অসীমতার রঙিন বৈচিত্র্যে পশু-পাখিদের জৈবিক ক্রিয়াকর্মের সঙ্গে মানুষের অবচেতন মনে লালিত জৈবিক বাসনার রঙিন অভিপ্রায়কে একই সমান্তরালে রেখে লেখক 'মীরবাড়ির কুরসিনাম' গল্পের ক্যানভাস নির্মাণ করেছেন যা আদতে নারী-শরীরের রহস্যময় প্রকৃতিকেই ব্যঞ্জিত করে।

আলোচনার উপসংহারে বলা যায়, আল মাহমুদ তাঁর গল্পবিশ্বের বাচনিক ক্যানভাস নির্মাণে জীবনের বহুমুখী আভিজ্ঞতাকে প্রকৃতির অসীমতার পাশে বসিয়ে সামগ্রিক মানুষের জৈবিক প্রবৃত্তির মনস্তাত্ত্বিক সমীকরণ বিনির্মাণ করেছেন যা নারী-শরীর ব্যতীত প্রায় অসম্ভব। তাই হয়ত বা স্বাভাবিকভাবেই তাঁর গল্পবিশ্বে ছড়িয়ে রয়েছে নারী-শরীরের রঙিন ও বর্ণময় কথকতার দ্বিরালাপিক অভিপ্রায়।

তথ্যসূত্র:

১. 'শ্রেষ্ঠ আল মাহমুদ', সম্পাদনা: ইমদাদুল হক মিলন, অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা-১১০০, প্রথম প্রকাশ- ফেব্রুয়ারি ২০০৫, চতুর্থ মুদ্রণ- জুলাই ২০১৮, পৃ: ২৮৭
২. তদেব, পৃ: ২৮৯
৩. তদেব, পৃ: ২৯৫
৪. তদেব, পৃ: ২৯৯
৫. তদেব, পৃ: ৩০৬
৬. তদেব, পৃ: ৩৩৫
৭. তদেব, পৃ: ৩৪৮
৮. তদেব, পৃ: ৩৫২
৯. তদেব, পৃ: ৩৫৮
১০. তদেব, পৃ: ৩৭০
১১. তদেব, পৃ: ৩৮১